নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ

পলিসি ব্রিফ

কার্যকর নির্বাচন কমিশন:
চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

১৯

নভেম্বর ২০১৩

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে নির্বাচন কমিশনের ওপর সাংবিধানিকভাবে কেন্দ্রীয় ভূমিকা অর্পিত হয়েছে। জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন ও জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচন, যেখানে নির্বাচন প্রক্রিয়া হতে হবে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ, যার প্রধান দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের।

গত পাঁচ বছরে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে নির্বাচনী ব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। এসব সংস্কারের মধ্যে বিভিন্ন আইনি সংস্কারের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতায়ন, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিয়ে আসা, নির্বাচন কমিশনে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন এবং নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে দলের আর্থিক তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করা, এবং নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায় সর্বোচ্চ সংখ্যক নির্বাচন গ্রহণযোগ্যভাবে আয়োজন, নির্বাচন অনুষ্ঠানে নিজস্ব ও দক্ষ জনবল ব্যবহার ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে। এসব অগ্রগতির ফলে দেশের নির্বাচনী সংস্কৃতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে, যার নিদর্শন পাওয়া যায় প্রধান রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের সাধারণভাবে আচরণ বিধি মেনে চলা এবং নির্বাচনী ফলাফল মেনে নেওয়ার মাধ্যমে।

তবে উপরোক্ত অগ্রগতির পাশাপাশি এখনো নির্বাচন কমিশনের সামনে যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ:

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সবার জন্য সমান ক্ষেত্র নিশ্চিত করা: সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর প্রেক্ষিতে সংসদ বহাল রেখে নির্বাচন হলে মন্ত্রী-সংসদ সদস্যদের তুলনায় অন্য প্রার্থীদের জন্য সমমানের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিত করা সম্ভব কিনা এই বিতর্কের মধ্যে কমিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচনী প্রচারণায় মন্ত্রী-সংসদ সদস্যদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার সাম্প্রতিক উদ্যোগ সমালোচনার সম্মুখীন হয়। এর সাথে যোগ হয়েছে কমিশন কর্তৃক প্রার্থিতা বাতিল সংক্রান্ত ধারা বাতিলের উদ্যোগ। কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি সত্ত্বেও নির্বাচন পরিচালনায় প্রশাসনের ওপর নির্ভরশীলতা অব্যাহত রয়েছে। প্রশাসনে সাম্প্রতিক বিতর্কিত রদবদল ও পদোন্নতির কারণে নির্বাচন পরিচালনায় প্রশাসনের ওপর দলীয় প্রভাবের আশংকা রয়েছে। এছাড়া আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা, নির্বাচনী প্রচারণায় কালোটাকা ও পেশীশক্তির প্রভাব নিয়ন্ত্রণ এবং আচরণ বিধি লঙ্ঘন রোধে কমিশন কর্তৃক কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করা কতটুকু সম্ভব এরূপ প্রশ্নে রয়েছে বিতর্ক। সম্প্রতি প্রার্থী-প্রতি নির্বাচনী ব্যয়সীমা বৃদ্ধি, দলীয় প্রধানকে এই ব্যয়সীমার বাইরে রাখা এবং দলপ্রতি অনুদানের সীমা বৃদ্ধির উদ্যোগের ফলে নির্বাচনে অর্থের প্রভাবের ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাজনৈতিক দলসহ অংশীজনের আস্থা অর্জন: নির্বাচন কমিশনের কিছু বিতর্কিত কার্যক্রম ও উদ্যোগ, যেমন একটি বৃহৎ দলের নেতৃত্ব প্রসঙ্গে বিতর্কে এক পর্যায়ে জড়িয়ে পড়া, একটি নতুন দলের নির্বাচনী প্রতীকসহ নিবন্ধন দেওয়ার প্রক্রিয়ায় প্রশ্নবিদ্ধ ভূমিকা, নির্বাচন কমিশনের প্রার্থিতা বাতিল সংক্রান্ত ধারা (৯১-ই) বাতিলের সুপারিশ, আচরণ বিধি লঙ্ঘনের শাস্তি কমানোর সুপারিশ, দশম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা নিয়ে সুস্পষ্টতার ঘাটতি ইত্যাদি নানাবিধ কারণে কমিশনের ওপর রাজনৈতিক দল সংশ্লিষ্ট অংশীজনের আস্থা অর্জন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া রয়েছে সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ, নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন ও ইভিএম ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক।

স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রভাব: সাম্প্রতিক বছরগুলোতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্টতা আরও শক্তিশালী হয়েছে, যা নিয়ন্ত্রণ করা কমিশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রশাসনিক সহায়তার প্রেক্ষিতে এসব নির্বাচন আয়োজনে কমিশন সরকারের ওপর নির্ভরশীল।

আইনি সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণ: বিভিন্ন আইনি সংস্কারের জন্য সরকারের ওপর নির্ভর করতে হয় নির্বাচন কমিশনকে। ফলে বিভিন্ন আইনি সীমাবদ্ধতা, যেমন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে সুনির্দিষ্ট আইন না থাকা, নির্বাচনের সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে পর্যাপ্ত ভূমিকা না থাকা, নির্বাচনী প্রচারণার আওতা ও শুরুর সময় নির্ধারিত না থাকা, নির্বাচনী ব্যয় নিরীক্ষা করার পদ্ধতি প্রচলন না থাকা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইনি সংস্কার কমিশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

আইন প্রয়োগে দৃঢ়তা প্রদর্শন: নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং নির্ধারিত সীমার বাইরে নির্বাচনী ব্যয় রোধ করা কমিশনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা: প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা কমিশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যার মধ্যে নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, এবং নির্বাচন কমিশনের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা উল্লেখযোগ্য। জনবল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করায় ঘাটতির কারণে কমিশনের পেশাগত দক্ষতা ও উৎকর্ষ হ্রাস পাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

সুপারিশ:

নির্বাচনী সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিভিন্ন সংস্কারের পরও বর্তমান বাস্তবতায় আরও সংস্কারের সুযোগ ও প্রয়োজন রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের ওপর সম্পন্ন গবেষণার ওপর ভিত্তি করে নির্বাচন কমিশনের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) পক্ষ থেকে নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করা হচ্ছে। তবে মনে রাখতে হবে, এসব সংস্কার বাস্তবায়ন করা নির্বাচন কমিশনের একার পক্ষে সম্ভব নয় - এক্ষেত্রে সব প্রধান স্টেকহোল্ডারের ভূমিকা রয়েছে।

১. নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

১.১ সকল অংশীজনের আস্থা অর্জন: রাজনৈতিক দলসহ সংশ্লিষ্ট সকলের, বিশেষকরে ভোটারদের আস্থা অর্জন করার জন্য নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমে নিম্নে উল্লিখিত উদ্যোগের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা প্রমাণ করতে হবে।

১.১.১ নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা খর্ব হয় এমন কোনো বিতর্কিত উদ্যোগ না নেওয়া, বরং শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা;
১.১.২ দলীয় প্রভাবমুক্ত হয়ে নির্বাচনী আইন ও বিধির প্রয়োগ নিশ্চিত করা;
১.১.৩ নির্বাচন ও কমিশন সম্পর্কিত সংস্কার উদ্যোগে সকল রাজনৈতিক দলসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা;
১.১.৪ নির্বাচনী আচরণ বিধি সংশোধনের মাধ্যমে নির্বাচনে সবার জন্য সমান ক্ষেত্র তৈরিতে কমিশনের ভূমিকা নিশ্চিত করা।

১.২ নির্বাচন পরিচালনায় কমিশনের নিজস্ব জনবল ব্যবহার: জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনায় কমিশনের নিজস্ব জনবল ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে প্রশিক্ষণসহ যোগ্যতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুসারে কমিশনের কর্মকর্তাদের প্রাধান্য দিতে হবে।

১.৩ নির্বাচনকে আরও বেশি প্রযুক্তিনির্ভর করা: ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন, ক্লোজ-সার্কিট ক্যামেরা, ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের নির্বাচনকে আরও বেশি প্রযুক্তিনির্ভর করতে হবে।

১.৪ নির্বাচন কমিশনের নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা: নির্বাচন কমিশনের যেসব কার্যক্রম নিয়মিতভাবে করার কথা, যেমন ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা, নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা ইত্যাদি আইন অনুসরণ করে প্রভাবমুক্ত হয়ে পেশাদারিত্বের সাথে অব্যাহত রাখতে হবে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কমিশন প্রণীত কৌশলগত পরিকল্পনা ও কর্ম-পরিকল্পনা বিবেচনায় নিয়ে, বিশেষকরে তার সাফল্য ও ব্যর্থতার নিরিখে বর্তমান কমিশনের কৌশলপত্র ও কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিতে হবে। একটি পঞ্চবার্ষিকী নির্বাচনী ক্যালেন্ডার তৈরি করে তা অনুসরণ করতে হবে।

১.৫ তথ্য প্রকাশ: নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে অধিকতর স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে বর্তমানে প্রকাশিত তথ্যের পাশাপাশি যেসব তথ্য নির্বাচন কমিশনকে প্রকাশ করতে হবে তার মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক দলের বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন, পুনর্নির্ধারিত নির্বাচনী আসনের ভোটারসংখ্যাসহ তালিকা, নির্বাচনী মামলা সংক্রান্ত তথ্য, নির্বাচন কমিশনের আয়োজিত সকল অংশীজনের সাথে সংলাপের ফলাফল বা প্রতিবেদন, স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সার্বিক তথ্য, নির্বাচন কমিশন বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন, এবং নির্বাচন কমিশনের বিস্তারিত বাজেট, বার্ষিক নিরীক্ষাকৃত আর্থিক বিবরণীসহ সকল দলিল।

২. সরকারের ভূমিকা

২.১ প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন: প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা ও বস্তুনিষ্ঠতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাংবিধানিক অঙ্গীকার অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করতে হবে। এই আইনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের যোগ্যতা, তাদের নিয়োগের প্রক্রিয়া, সংখ্যা, অপসারণের পদ্ধতি সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধান থাকতে হবে। এই প্রক্রিয়া হতে হবে দলনিরপেক্ষ, স্বচ্ছ এবং সবগুলো রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

২.২ আইনি সংস্কার: নির্বাচনী আইনের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা দূর করতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে:

২.২.১ নির্বাচনকালীন সময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্বরাষ্ট্র, জনপ্রশাসন, স্থানীয় সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পদায়ন ও বদলির ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক করা;
২.২.২ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরবর্তী তিনমাস পর্যন্ত নির্বাচনকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে (যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে) কমিশনের অধীনে রাখা;
২.২.৩ প্রার্থিতা বাতিল, সংসদ সদস্যপদ বাতিল, ইভিএম ব্যবহারের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
২.২.৪ স্থানীয় কমিটির মনোনয়নকৃত প্রার্থীদের মধ্য থেকেই মনোনয়ন দান বাধ্যতামূলক করা;
২.২.৫ সংশোধিত সংবিধানের আলোকে নির্বাচনী আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা;
২.২.৬ প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন যাচাই-বাছাই অন্তর্ভুক্ত করা;
২.২.৭ রাজনৈতিক দলের আর্থিক বিবরণী প্রকাশ সংক্রান্ত ধারা অন্তর্ভুক্ত করা;
২.২.৮ আচরণ বিধি লঙ্ঘন সংক্রান্ত শাস্তির ক্ষেত্রে আইনে সব ধরনের অসামঞ্জস্যতা দূর করা;
২.২.৯ নির্বাচনী ট্রাইবুনালের অধীনে অভিযোগ দায়ের করার পরবর্তী ছয়মাসের মধ্যে আপিলসহ অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা;
২.২.১০ রাজনৈতিক দল ও জাতীয় নির্বাচনে নারী, সংখ্যালঘু ও প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য প্রযোজ্য আইন সংশোধনের মাধ্যমে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা;
২.২.১১ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 'না' ভোটের পুনঃ প্রচলন করা।

৩. রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

৩.১ সংসদ সদস্যদের আর্থিক তথ্য প্রকাশ: প্রতি বছর সংসদ সদস্যদের আর্থিক তথ্য নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে হবে, যা নির্বাচন কমিশন জনগণের জন্য প্রকাশ করবে।

৩.২ রাজনৈতিক দলের আর্থিক তথ্য প্রকাশ: প্রতিটি রাজনৈতিক দলের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং দলের আয়, ব্যয় এবং সম্পদের হালনাগাদকৃত তথ্য প্রকাশ করতে হবে।

৩.৩ সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চা: রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে গণতন্ত্রের চর্চা বাড়াতে হবে। তৃণমূল থেকে মনোনীত এবং সৎ, জনগণ-সম্পৃক্ত, জনকল্যাণে নিয়োজিত, অসাম্প্রদায়িক, রাজনীতির অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ব্যক্তিকে জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিতে হবে। এক্ষেত্রে নারী, সংখ্যালঘু ও অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিতদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। দুর্নীতিপরায়ণ, কালো টাকার মালিক ও সন্ত্রাসীদের নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়া যাবে না।

৩.৪ নির্দলীয় স্থানীয় সরকার নির্বাচন: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনকে দলীয় প্রভাবের বাইরে রাখতে হবে।

৪. নাগরিক সংগঠনের ভূমিকা

৪.১ নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ: নাগরিক সংগঠন কর্তৃক প্রথাগত নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি কমিশনের কার্যক্রম, নির্বাচনী অর্থায়ন এবং ব্যয় আইনানুগ ও স্বচ্ছ হচ্ছে কি না তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

৫. গণমাধ্যমের ভূমিকা

৫.১ নির্বাচনী তথ্য প্রকাশ: প্রতিটি রাজনৈতিক দলের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং দলের আয়, ব্যয় এবং সম্পদের হালনাগাদকৃত তথ্য প্রকাশ করতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে টিআইবি ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'পরিবর্তন-ড্রাইভিং চেঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্তামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে। বিগত ১৯৯৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১৮টি পলিসি ব্রিফ প্রণীত হয়েছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮০-২-৯৮৬২০৪১, ৮৮২৬০৩৬, ৯৮৮৭৮৮৪
ফ্যাক্স: ৯৮৮৪৮১১
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www. ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www. facebook.com/TIBangladesh